রক্তবীজ

কাহিনীঃ আবীর রায়

(প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে)

ঘটনা ১

১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাস। দেবমালি পর্বতের পাদদেশের ছোট্ট একটি গ্রামের এক কৃষক ভোরবেলা প্রাতঃকৃত সারতে মাঠে আসতেই তার কানে আসে অস্ফুট এক শিশুর কান্নার আওয়াজ। এদিক ওদিক তাকাতেই তার চোখে পড়ে ঝিলের ধারে একটি ক্ষুদ্র হাত ও মাথা নরম মাটির ওপর দেখা যাচ্ছে। দৌড়ে কাছে যায় সে। দেখে শিশুটির শরীরের প্রায় বারো আনাই মাটি চাপা দেওয়া। বেরিয়ে রয়েছে শুধু মাথা, বাম হাত আর বুকের কিছুটা অংশ। করুণায় ভরে ওঠে কৃষকের মন। কত বড় শয়তান একটি সদ্যজাতকে এইভাবে জ্যান্ত কবর দেওয়ার পরিকল্পনা করতে পারে! জন্ম কেন দেয় সন্তানের যদি পালন করার ক্ষমতা না থাকে! কৃষক নিচু হয়ে শিশুটিকে পরম স্নেহে বের করে আনে। তার সর্বাঙ্গ ঢাকা রক্ত আর কাদায়। গলা ফাটিয়ে কেঁদে চলেছে সে। গলার গামছা দিয়ে ছোট্ট দেহটিকে মুছিয়ে দিতে গিয়েই হঠাৎ কৃষকের বুক কেঁপে ওঠে! শিশুটির

নাভিমূল থেকে ঝুলছে রক্তমাখা নাড়ি এবং সেটির সংযোগ মাটির ভেতর! উপড়ে আসা মাটির ফাঁক দিয়ে এখনও দেখা যাচ্ছে টাটকা রক্তে ভরা একটি গর্ভকুম্ভ!

ঘটনা ২

সালটা ১৯৫৫। ভোপাল আর জব্বলপুরের মধ্যবর্তী রাস্তা। সন্ধ্যার অন্ধকারে হঠাৎ সজোরে জীপের ব্রেক কষলেন এক অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল। সাথে তাঁর স্ত্রী। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় তিনি দেখেন অন্ধকারের মধ্যে একটি বাচ্চা হামা দিয়ে রাস্তা পের হচ্ছে। অথচ জঙ্গলের মধ্যে এরকম সময় একলা... কেউ কি তাদের বাচ্চা ফেলে গেলো? এগিয়ে গিয়ে তাঁর স্ত্রী কোলে তুলে নিলেন বাচ্চাটিকে। রাস্তায় গাড়িটি গাড্ডায় পড়ায় বাচ্চাটি ঝাঁকুনি খেল ভদ্রমহিলার কোলের মধ্যেই। ককিয়ে কেঁদে উঠল সে। আঁতকে উঠলেন কর্নেলএর স্ত্রী। বাচ্চাটির চোখ দিয়ে জলের বদলে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে!

ঘটনা ৩

১৯৭৭। শিলিগুড়ির সেবকে পাহাড়ের ঢালে এক পরিত্যক্ত কুঁড়েঘর। এক রাতে উপত্যকার অধিবাসীরা সেই বাড়িটির আশপাশ থেকে সারা রাত শিশুকণ্ঠের চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পায়। ওই কুঁড়েঘরটিতেই কয়েকমাস আগে এক হতদরিদ্র আর রোগসর্বস্ব পরিবারের ১২ বছরের পালিত পুত্র ঘুমের মধ্যে তার বাবা, মা ও ছোটবোনকে ঘুমের মধ্যে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে উঠোনের এক কোণায় গিয়ে ক্ষুর দিয়ে নিজের গলার নালি কেটে আত্মহত্যা করে। কেন? কেউ জানে না...

***

২০০৮ সাল। পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট শহর রূপনারায়ণপুর। বাংলা আর বিহারের বর্ডারে হলেও এখানে বিহারী উদ্বাস্তুদেরই বাস বেশি। মানুষের বসতি থাকলেও জায়গাটা ফাঁকা ফাঁকা, রাস্তাঘাট চওড়া আর পরিচ্ছন্ন হলেও

সন্ধে নামলেই গোটা শহরটা কেমন নিঝুম হয়ে পড়ে। নগরের পশ্চিম কোণায় বহু পুরনো একটা রেলের পরিত্যক্ত কোয়ার্টারে ছোটখাটো একটা মেয়েদের মেসবাড়ী গড়ে উঠেছে। জানি এখানে থাকাটা হয়ত আইনবিরুদ্ধ কিন্তু গত দশ বছরে রেলের কোনও বাবুর টিকির দেখাও পাওয়া যায়নি, কাজেই এক রকম নিশ্চিন্তেই গর্হিত কাজ জেনেও এখানে আবাসিকরা থাকে।

আমি হিন্দুস্তান কেবিলস এ সামান্য স্টেনোর কাজ করি। থাকি আসানসোলে। কোম্পানির দেওয়া কোয়ার্টারে ছাব্বিশ বছরের একলা মেয়ের থাকাটা নিরাপদ নয় বলে একটু দূর হলেও এই মেসে ঘর নিয়েছি। দেখতে শুনতে আমি একেবারেই সাধারণ। অসাধারন হওয়ার কোনোদিন কোনও তাগিদও অনুভব করিনি। গায়ের রং বেশ কালো। তবে গড়নটা লম্বা ও ছিপছিপে। বাড়ি থেকে বিয়ের জন্য পাত্র ঠিক করে রেখেছে। আমি মতও দিই নি, অমতও না। সে পেশায় শিক্ষক। তার সাথে আমার পরিচয়

থাকলেও বন্ধুত্বও নেই, আবার তিক্ততাও নেই। মোটের ওপর এই আমার জীবন। নিরস, ফ্যাকাসে, সাদামাটা।

শুক্রবারের বিকেল। আজ বাড়ি যেতে পারিনি। হেমন্ত কেটে শীত পড়ে গেলেও আজ সকাল থেকে মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ার সাথে চলছে একটানা ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টি। বোধহয় নিম্নচাপ হয়েছে। মেসের মাঝের ঘরটায় আমরা সবাই জড়ো হয়েছি। আমরা বলতে আমরা ৫ জন; মালতী, কাবেরীদি, অনুসূয়াদি, রমা, আর আমি: শিবানী। অনুসূয়াদি আমাদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে প্রবীণ। ওনার বাড়ি অন্ডালএ, স্বামী জাহাজে কাজ করে, তাই প্রায় সারা বছরই বাইরে থাকে। অনুসূয়াদির তাই বাড়ি যাওয়ার বড় একটা গরজ নেই। ছেলেপুলেও হয়নি, পেশা বলতে চিত্তরঞ্জনে উওমেন'স কলেজএ ফিলোজফী পড়ান। তবে দর্শনশাস্ত্র ছাড়াও ভদ্রমহিলার বহু বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য। প্যারানরমাল বা অতিবাস্তব সম্পর্কে একসময়

বিস্তর পড়াশুনো করেছেন, তারাপীঠের মহাশ্মশানে প্যারানরমাল সোসাইটির লোকজনের সাথে রাত কাটিয়েছেন! এছাড়াও আজকের দিনে বেদান্ত, মনুস্মৃতি, ও পুরাণের অষ্টাদশ খণ্ড পড়া মানুষ কটা পাওয়া যাবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

রূপনারায়ণপুরের বহুদিনের বদঅভ্যেস, ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় লোডশেডিং হয়ে যায়। আজও তার বিকল্প হল না। ঘরের মাঝখানে একটা পুরুষ্টু মোমবাতি জ্বালিয়ে আমরা খোশগল্পে মজলাম। গপ্প বলায় অনুসূয়াদি ছিল এক নম্বর। এরকম পরিস্থিতিতে প্রায় সর্বদাই যা হয়ে থাকে, আমরা অনুসূয়াদিকে চেপে ধরলাম ভূতের গল্প শোনানোর জন্যে। আমরা সবাই গোল হয়ে শতরঞ্চিতে বসেছিলাম। অনুসূয়াদি বেতের মোড়াটা টেনে আমাদের বলয়ের মাঝামাঝি একটা জায়গায় বসে অল্প হেসে শুরু করল,
“তোমাদের কাছে ভূত বলতে কি? আত্মা?

ছায়ামূর্তি? পিশাচ?... গল্পের বইয়ে, টিভির পর্দায় এদেরই আমরা দেখে আসি, মনে করি এরাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, সবচেয়ে ক্ষতিকারক? কিন্তু একটু যদি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলিকে উলটে পালটে দেখো, তাহলে দেখবে তাদের মধ্যে ভূত প্রেতের কোন উল্লেখই নেই।... কিন্তু তা বলে কি সত্যিই অশুভ শক্তি নেই?"

আমরা চুপচাপ। মোমবাতির কম্পিত শিখার প্রতিচ্ছবিটা অনুসূয়াদির চশমার ওপর অল্প অল্প দুলছে।

"পার্সিয়ান উপকথায় "ইব্লিস" বলে একটা শব্দ আছে, হিন্দু শাস্ত্রে যাদের বলে "অপদেবতা" বা "মায়াবী", আর বাইবেল এদের বলে "ডিমনিক এন্টিটি"! তারা নশ্বর আর অনশ্বরএর মাঝামাঝি আটকে থাকে। এইসব শক্তিরা মানুষের রূপে রক্তমাংসের পৃথিবীতে বিচরণ করলেও এদের জীবনধারণ হয় নারকীয়। এদের আদি নেই, অন্ত নেই। কোনও ধর্মীয় শুদ্ধাচার এদের ক্ষতি করতে পারেনা। এদের আগমন বিধ্বংস ঘটায়, অশুভ আর বিনাশের

দূত হয়ে এরা পৃথিবীর বুকে হানা দেয়। স্নেহ, ভালবাসা, সাহস, আশা আস্তে আস্তে সব গ্রাস করে নেয় এদের শিকারের জীবন থেকে... এদের নজর একবার লেগে গেলে জীবন অভিশপ্ত হয়ে যায়। তখন মৃত্যুকেও সহজ মনে হয়...”

মালতী বলল, “এসব ত নিছকই গল্প তাই না? সত্যিই কি পুরাণের এই জীবগুলির আজ অস্তিত্ব থাকা সম্ভব? এই সায়েন্সের যুগে?”

অনুসূয়াদি চশমাটা খুলে শাড়ির আঁচলে মুছতে মুছতে বলল, “আমরা অনেকেই মনে করি হনুমান আজও জীবিত, অশ্বত্থামা আজও তার কপালের ক্ষত নিয়ে দিশাহীন হয়ে অনন্তকাল ধরে পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অমর লামা ইতিগিলভ্ বৌদ্ধদের মতে প্রায় এক শতাব্দী ধরে অনন্ত সমাধিতে লীন রয়েছেন ও যেকোনো সময় বেঁচে উঠতে পারেন... পুরটাই বিশ্বাসের ওপর। এগুলির কোনওটারই কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। কিন্তু এখন আমি তোমাদের যেই ঘটনাপঞ্জির বিবরণ দেবো তার কোন ব্যাখ্যা

আমি আজও অব্দি খুঁজে পাইনি। ধর্মান্ধতা নিয়ে হায়ার স্টাডিজে রিসার্চ করার সময় আমি কিছু ঘটনা জানতে পারি, যেগুলিকে পর পর সাজালে যা দাঁড়ায় তা বুঝলে যে কারোর শিরদাঁড়া ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।”

আমরা বোবা হয়ে শুনছি। ঘরে একটা আলপিন পরলেও বুঝি তার আওয়াজ পাওয়া যাবে। রমা ইতিমধ্যেই চা নিয়ে এসেছে। অনুসূয়াদি চায়ে সশব্দে চুমুক দিয়ে শুরু করল, “প্রথম ঘটনার সময় ১৯১২ সাল। উৎকল দেশের এক গ্রামে এক কৃষক তার জমির ধারের ঝিলের পাশে কুঁড়িয়ে পায় এক শিশুকে। গ্রামে বহুদিন ধরে ইংরেজ পুলিশ ধর-পাকড় চালাচ্ছে। কয়েকমাস আগে তার জমিতেই এক রাতে ৯ জন যুবককে স্বদেশী সন্দেহে গুলি করে মারে পুলিশ। সকাল অব্দি লাশ মাঠেই পড়েছিল। তার কয়েকমাস পর সেই জমি থেকেই উদ্ধার হয় অজ্ঞাতপরিচয় এক শিশু। কৃষকের নিজের দুই সন্তান থাকা সত্ত্বেও মায়ার বশে তিনি তৃতীয় শিশুটিকে ঘরে তোলেন। এরপর থেকেই তাদের পরিবারে

আসতে থাকে একের পর এক বিপর্যয়। প্রথমে তার স্ত্রী উন্মাদ হয়ে ঝিলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে, তারপর তার বড় মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে উনুন জ্বালাতে গিয়ে গায়ে আগুন লাগিয়ে ফেলে প্রচণ্ডভাবে আহত হয়। সব শেষে কৃষক নিজে যক্ষ্মায় মারা যায়। তার পালিত পুত্র... নিরুদ্দেশ!

"দ্বিতীয় ঘটনা, পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি; মধ্যপ্রদেশে। জঙ্গলের মধ্যে থেকে এক সৈনিক দম্পতী একটি অগ্যাত পরিচয় শিশু উদ্ধার করে জব্বলপুরের তাদের সরকারী আবাসনে নিয়ে আসেন। এর পনেরো দিনের মধ্যে জনৈক সৈনিকের স্ত্রীর স্কিতজোফ্রেনিয়া ধরা পড়ে। রাতের অন্ধকারে ঘরের কোণের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠতেন। নখ দিয়ে দেওয়াল আঁচড়ে আঁচড়ে রক্তারক্তি করে ফেলেছিলেন। শেষ সময়ে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে ঘরে তাঁকে বেঁধে রাখতে হত। একদিন কর্নেল ঘরে ঢুকে দেখেন। মেঝের মধ্যে উলঙ্গ হয়ে তাঁর স্ত্রী মরে পড়ে আছেন। মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

মেঝেময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে তাঁর দাঁতগুলি। মরার আগে কোন অজানা জিঘাংসায় খেতে দেওয়ার চামচের হাতল দিয়ে নিজে নিজের দাঁতগুলিকে উপড়ে উপড়ে ফেলেছেন!

"স্ত্রীর মৃত্যুর পর ভদ্রলোক শিশুটিকে নিয়ে চলে আসেন তাঁর পৈত্রিক বাড়ি মিরিকে। কিন্তু পথে তাঁর গাড়ি সেবক ব্রিজের কাছে খাদে পড়ে। ভদ্রলোকের সাথে শিশুটিরও ঘাড় মটকানো মুখ থেঁতলানো রক্তমাখা দেহ তিস্তার পার থেকে উদ্ধার হয়। আর ড্রাইভার মাথায় চোট পেয়ে বাকশক্তি হারায় চিরদিনের জন্য... "

বাইরে বৃষ্টির আওয়াজ বাড়ল। সেই সাথে বাজের চাপা গর্জন। হঠাৎ কেঁপে উঠলাম নিজে থেকেই। মোমবাতিটা প্রায় অর্ধেক পুড়ে গেছে।

"তৃতীয় ঘটনাটি সবচেয়ে ভয়ের! তিস্তার চর থেকে একটি পুরুষ-শিশু কুড়িয়ে পায় এক দরিদ্র জেলে। নিঃসন্তান থাকার কারনে কাউকে কিছু না জানিয়েই বাচ্চাটিকে নিয়ে ঘরে চলে আশে জেলেটি। এর ২ বছরের মধ্যে তার স্ত্রী

সন্তানসম্ভবা হয়। কিন্তু তারপর মৃত বাচ্চা প্রসব করে। বছর দুয়েক পর আবার তার গর্ভে সন্তান আসে। এবার সে একটি কন্যাসন্তান প্রসব করে কিন্তু শিশুটি অন্ধ জন্মায়! একদিন শেষ রাতে গ্রামের লোক দেখে যে তাদের কুঁড়েটি দাউ দাউ করে জ্বলছে। সবাই দৌড়ে এলে দেখে জেলে দম্পতী ও তাদের মেয়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ১২ বছরের ছেলেটির মৃতদেহ মেলে পেছনের উঠোনে। গলা ফালা করা অবস্থায়। সবাই বলে ছেলেটার মাথায় বিকৃতি ছিল। বাবা মা বোনকে মেরে সে নিজেই নাকি নিজের গলা কেটে নিজেকে শেষ করেছে!”

এই পর্যন্ত বলে থামল অনুসূয়াদি।

ঘরে টিমটিমে মোমের আলোয় বাকরুদ্ধ আমরা পাঁচজন। কারো মুখে রা নেই। অন্য বৃষ্টির দিনের মত আজ একটাও ব্যাঙের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছেনা।

“কিন্তু এই ঘটনাগুলির একে অপরের সাথে সম্পর্ক কোথায়?” মিনমিন করে মালতী জিজ্ঞেস করল।

অনুসূয়াদি থেমে বলল, “প্রাচীন এক অপদেবতা আজও মানুষের রূপে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে!” গলা কেঁপে উঠল অনুসূয়াদির। এই তিনতে ঘটনাই তার উপস্থিতির সবচেয়ে বড় প্রমাণ!”

“অপদেবতা!?” শব্দটা বিস্ময়সূচক প্রশ্নের স্বরে আমার গলা দিয়ে বেরোল!

“রক্তবীজ!”

ঝলসে উঠল বিদ্যুতের আলো!

রক্তবীজ... রক্তবীজ... রক্তবীজ...

নামটা মুখে মুখে ফিসফিসে গলায় দু-তিনবার উচ্চারণ হল। কিন্তু সে ত এক পৌরাণিক দানব... বাস্তবে তার অস্তিত্ব থাকা কি সম্ভব?

“পুরাণে কথিত আছে মহিষী শ্যামলার চিতার আগুন থেকে উৎপত্তি হয় দুই দানবের। প্রথমজনকে আমরা চিনি মহিষাসুর বলে, দ্বিতীয় জন ছিল আরও মারাত্মক। তার এক ফোঁটা রক্তও যদি ভূমি স্পর্শ করে তাহলে সেইখানে জন্ম নেবে তারই আরেক মূর্তি। যেই কারণে তার নাম হয় ‘রক্তবীজ’। তাকে কাবু

করতে দেবী চামুণ্ডার সাহায্য নিতে হয় অষ্টমাতৃকাকে। শেষে দেবী চামুণ্ডা তার সমস্ত রক্ত পান করে নিজের মধ্যে নিয়ে নেন। পৌরাণিক এই গাথা হয়ত এরকমই কোনও অপদেবতাকে ভেবে লেখা হয়েছিল। ১৯১২ সালে উড়িষ্যায় যারা পুলিশের গুলিতে মরে, তাদের মধ্যে একজন ছিল এই বহুরূপী শয়তান। যেই মাটিতে তার রক্ত পড়েছিল সেইখানেই জন্ম নেয় আরেক রক্তজাতক। তারপর সেই কৃষকের পরিবারকে ধ্বংস করে পাড়ি দেয় নতুন শিকারের খোঁজে। পঞ্চাশের দশকে সৈনিক দম্পতী যাকে পেয়েছিল, তার জন্ম সম্ভবত সেই জঙ্গলের কোথাও, মাটির গভীরে। তারপর সেই পরিবারটিকেও মেরে সে এসে পৌঁছয় বাংলার মাটিতে। গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট যেইখানে হয়। তার কয়েকমাসের মধ্যে সেই জেলে সেইখান থেকেই এক পরিত্যক্ত রহস্যময় শিশু উদ্ধার করে। একি রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি। একের পর এক পরিবারের শিকার। প্রত্যেকবার শিকারের শেষে

রক্তাক্ত আত্মাহুতি... তারপর আবার মাটির গভীরে পৈশাচিক নবজন্ম! আবার নতুন শিকারের খোঁজ। আবার কোনও করুণাময় হতভাগ্য পরিবার বুকে টেনে নেবে মাটি ফুঁড়ে বেড়িয়ে আসা মূর্তিমান মৃত্যুদূতকে...”

থামল অনুসূয়াদি। লম্বা শ্বাস নিল দুবার।

রক্তবীজ... নামটা মনে আসতেই ঠাণ্ডা রক্তের স্রোত বয়ে গেলো শিরদাঁড়া দিয়ে। ভূমির গর্ভে জন্ম নেওয়া এক প্রাচীন অপদেবতা যে আজও কোনও না কোনও রূপে পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার পরের শিকারের খোঁজে।

সেই রাতে আমার খুব জ্বর এলো। এবং তার পরের দিনটাও বিছানায় কাটালাম। মেসের কেয়ারটেকার ঝুঁকি না নিয়ে বাড়িতে খবর দিল। মা বাবা দুজনেরই বয়স হয়েছে। তার ওপর হাই সুগারে বাবার একটা চোখে দৃষ্টি প্রায় নেই বললেই চলে, তার ওপর অনেক পুরনো একটা ব্যাথার জন্য চলাফেরা প্রায় বন্ধ। আমি বাড়ি ফেরার পর মা একা হাতে দুই রুগীকে সামলাতে হিমসিম খেতে লাগলো। ডাক্তার

জানিয়ে দিল আমার ক্রনিক টাইফয়েড হয়েছে, সারতে বেশ কয়েকদিন লাগবে। মাঝে মাঝে রাতে জ্বরের ঘোরে ঘুম ভেঙ্গে যেত। দেখতাম শিয়রের কাছে মা বসে আছে। চোখে জল... জিজ্ঞেস করতে বলত, "একটা মাত্র মেয়ে... তার চিন্তায় চিন্তায় মানুষটার কি হাল হয়েছে দেখ। একটা যদি হিল্লে হয়ে যেত তোর।" আমি বুঝতাম যেকোনো নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহিণীর মত আমার মাও আমার "হিল্লে" বলতে বিয়ে দিয়ে দিতে চায় এবার। কারন মেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যতই রোজগার করুক, ভাল পাত্রর গলায় না ঝুললে তার "হিল্লে" হয় কিভাবে? অতএব হাসি মুখে বিয়েতে রাজি হলাম। কিন্তু শর্ত দিলাম যে ধূমধাম করে একগুচ্ছের লোক খাইয়ে কষ্টের পয়সা জলাঞ্জলি দিয়ে নয়। ছোট পারিবারিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রেজিস্ট্রি করে নেব আমি আর অংকুর। আমি জানতাম সেও তাই চাইবে কারন তার পরিবার বলতে এক পঙ্গু বিধবা মা। আর প্রাইমারী টিচার হিসেবে তার রোজগারও

খুব আহামরি কিছু না। তবু কিনা সরকারি চাকরি। আমার বাবা মা তাতেই খুশি।
নির্দিষ্ট দিনে আমাদের বিয়ে হল। আমি ছোট থেকেই বয়স আন্দাজে একটু বেশি পাকা। অল্প রোজগেরে পরিবারের একমাত্র মেয়েরা বোধহয় সবাই তাই হয়। নিজেই নিজের বিয়ের সব ব্যবস্থা করেছিলাম। তবু কোন মেয়ের না সাজতে ভাল লাগে বিয়ের দিন? আমায় দেখতে একেবারেই ডানা কাটা পরীর মত নয়। তবু যখন শুভদৃষ্টির সময় অংকুর আমায় কণে বেশে প্রথমবার দেখল, কিছুক্ষণের জন্য মুখ থেকে চোখ সরাতে পারলো না। ওর ঠোঁটের কোণায় হাসির ঝলকটা দেখে বুঝেছিলাম হয়ত বিয়েটা পুরোপুরি "অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ" রইল না।
কর্মসূত্রে ও চিত্তরঞ্জনের আর আমি রূপনারায়ণপুরের সাথে জড়িয়ে। কাজেই বিয়ের পর রূপনারায়ণপুরেই একটা পুরনো একতলা বাড়ি ভাড়া নিলাম। বাড়িটা সে অর্থে কোনও পাড়ার মধ্যে নয়। জনবসতি থেকে

একটু দূরে, নিরিবিলি গাছে ঘেরা একটা জমির এক প্রান্তে। সামনে টালির বারান্দা আর পেছনদিকটা অনেকটা বড় বাগান। এখানে এসে থেকেই আমার শাশুড়ির শরীরটা খারাপ হতে থাকল। হাঁটাচলার ক্ষমতা এমনিতেই ছিল না, এবার যেন মাথাতেও অল্প ছিট দেখা দিতে লাগলো। একদিন আমি রাতে উঠে বাথরুম যাব, দেখি উনি বাইরের ঘরে নিজের চৌকির ওপর টান হয়ে অন্ধকারে বসে আছেন। হুট করে দেখলে যে কারোর বুকটা ছ্যাঁত করে উঠবে। কাছে যেতেই দেখলাম বিস্ফারিত চোখে সামনে ঝোলানো নিজের মরা স্বামীর ছবিটার দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বলে যাচ্ছেন, "ও কে? ও কে?..."
আমি গিয়ে ওনার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, "কি হয়েছে মা? উনি ত আপনার স্বামী... ওনাকে চিনতে পারছেন না?"
শাশুড়ি ঘাড় নেড়ে বললেন, "স্বামী... স্বামী খুব ভুল করেছে। আমরা খুব ভুল করেছি... ও কে? কে ও?"

গলা শুকিয়ে এলো ভয়ে। একে নতুন বাড়ি। দুটো মাত্র মানুষ ঘরে... তারমধ্যে...। একটা ঘুমের ওষুধ দিয়ে শুয়ে দিলাম ওনাকে।
আমার কর্তা এমনিতে খুব ভোরে ওঠে। আমার সে রাতে ঘুম হলনা। আমায় এপাশ ওপাশ করতে দেখে ভোর রাত থাকতেই তার ঘুম গেল ভেঙ্গে।
“কি হল গো? ঘুমোও নি?”
“না, মায়ের বোধহয় প্রেশারটা বেড়েছে বুঝলে, মাঝরাতে উঠে কিসব বলছিল। ”
“কি বলছিল?” ঘুম জড়ানো গলায় ও জিজ্ঞেস করল।
“তোমার বাবার ছবিটার দিকে তাকিয়ে বলছিল খুব ভুল করে ফেলেছে... তারপর “ও কে? ও কে?” করে উঠল।”
অংকুর জড়িয়ে ধরল আমায়। টেনে নিলো বুকের কাছে। আমাদের বিয়ের প্রায় এক মাস হয়ে এলেও এত কাছাকাছি কখনও আসিনি আমরা।
“এবার ঘুম হবে?” কানের কাছে ফিসফিস করে

বলল। আমি ঘাড়ের কাছে অনুভুতি পেলাম তার উষ্ণ নিঃশ্বাসের। আমার শরীরের লোমগুলো যেন খাড়া হয়ে গেলো এক ধাক্কায়। অংকুর চুমু খেল আমার ঘাড়ের কাছে। তারপর আমার রাতের পোশাক নামিয়ে আমার খোলা পিঠে। আমার শিরায় শিরায় যেন এক অজানা আবেশের ঝংকার খেলে গেলো। ওর হাত দুটো চেপে ধরলাম আমার বুকের উপরে। অন্ধ হয়ে গেলাম উন্মাদনায়। বিয়ের উপহারের চাদরের ওপর দুটো শরীর একটু একটু করে একে অপরের মধ্যে হারিয়ে যেতে লাগলো। একটা একটা করে আবরণ হারাতে লাগলো আমার আর আমার জীবনসঙ্গীর দেহ। অন্তর্বাসের শেষ টুকরোটুকুর সাথেই খসে পড়ল আমার কুমারিত্বের শেষ লজ্জার রেশটুকু। পশুর মত ওর মাথাটাকে চেপে ধরলাম আমার বুকের মধ্যে। রাতের শেষ অন্ধকারটুকু আমাদের নগ্নতার মাধুর্যকে আড়াল করে যেন আমাদের সঙ্গমের মর্যাদাটুকু রক্ষা করে গেলো।

পরদিন সকালে উঠতে বেশ দেরি হল আমার।

উঠে দেখি ঘর পরিষ্কার । ঘুমের ঘোরেই কখন যেন আমার গায়ে আলতো করে হাউসকোটটা পড়িয়ে দিয়ে গায়ে চাদর টেনে গেছে। পাশ ফিরে দেখলাম ওর কাজে যাওয়ার ব্যাগটা নেই। আমার উঠতে দেরি দেখে নিশ্চয়ই না খেয়ে আজ বেড়িয়ে গেছে। ইস! এরকম ভুল আর কোনোদিন হবেনা।
মুখটা চট করে ধুয়ে বাইরে বেড়িয়ে এলাম। দেখলাম চৌকির ওপর পাস ফিরে শাশুড়ি মা শুয়ে আছেন। কি হল? এত বেলা অব্দি ত উনি শুয়ে থাকেন না। উনি ত আমাদের সবার আগে ওঠেন। তাড়াতাড়ি খাটের ওপারে যেতেই আঁতকে উঠলাম। মুখ হাঁ করে মরে কাঠ হয়ে গেছেন উনি! চোখ দুটো রক্তের মত লাল... চোয়ালটা বেঁকে একদিকে হেলে গেছে। চিৎকার করে মেঝেতে বসে পড়লাম!
অংকুর ফিরতে ফিরতে আরও ঘণ্টা দেড়েক লাগলো। খবর পেয়ে আমার পুরনো মেসের দু একজন এসেছিল। ডাক্তার বলল ভোরের দিকে ম্যাসিভ স্ট্রোক হয়েছে। ঝটকাটা এতটাই তীব্র

ছিল যে ব্রেনের শিরা ফাটিয়ে দিয়েছে। যেই কারণে চোখে ও নাকের নল অব্দি রক্ত উঠে এসেছে!
অংকুর তার পর থেকে আমার ওপর প্রচণ্ড রকম নির্ভরশীল হয়ে গেলো। গুরুদশার সময় দেখতাম প্রায়ই আমায় ছাড়া দোকান পর্যন্ত যেতে চাইত না। পরিবার বলতে আমি ছাড়া একমাত্র মা ছিল। সেও এইভাবে চলে যাওয়াতে মনে ভয় আর নিরাপত্তাহীনতা দুটোই চেপে বসেছিল। তাই এই হঠাৎ পরিবর্তন। মাঝে মাঝেই দেখতাম দূরে বসে আমার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে। যেন কিছুর বলতে চায়, অথবা শুনতে চায়। আমি গিয়ে জড়িয়ে ধরতাম। ও কিচ্ছুটি বলত না।
শাশুড়ির শ্রাদ্ধ শান্তি হয়ে গেলে ও আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করল। সেদিন বিকেল বেলা অংকুর বাড়ি অন্য দিনের তুলনায় আগে ফিরল। দেখলাম মুখটা হাসি হাসি, লাজুক লাজুক। যাক বাবা, এতদিন পর মুখে হাসি ফুটেছে। সে এগিয়ে এসে আমার হাতটা নিজের

হাতে নিয়ে তার মধ্যে একটা কাগজের ছোট মোড়ক ধরিয়ে দিল।
“কি এটা?” কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।
“খুলে দেখো।”
সন্তর্পণে মোড়কটা খুলে আমি লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম, দেখি তার মধ্যে একটা প্রেগনেন্সি টেস্ট কার্ড!
অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি কি করে জানলে আমার পিরিয়ড হচ্ছে না?”
উত্তরে মুচকি হাসল ও। আমি জানি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এসব ব্যাপারে লজ্জা থাকা উচিৎ নয় তবু কেন যেন লজ্জায় তার মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। মনে একটা খুশির বেলুন যেন ফুলে উঠে বুকটা ভরিয়ে দিয়েছিলো।
পরদিন সকালে টেস্ট করলাম। একটা দাগ হয়ে রইল। মনমরা হয়ে কার্ডটা প্যাকেটে ফের চালান দিতে যাব এমন সময় দেখি দ্বিতীয় দাগটা হালকা করে ফুটে উঠল। তারপর ধিরে ধিরে প্রথমটার থেকেও গাঢ় হয়ে গেলো।
বাথরুম থেকে প্রায় লাফ দিয়ে বেড়িয়ে এসে

অংকুরকে জড়িয়ে ধরলাম। সেও আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমায় দুবার হাওয়ায় ঘুরিয়ে আলতো করে বিছানায় বসিয়ে দিল। তারপর আমার হাতটা মুঠো করে ধরে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ। এরকম সময় আমাদের এরকম একটা খবরের খুব দরকার ছিল।"

কাজে বেরনোর আগে পই পই করে বলে গেলো আমি যেন বেশি খাটা খাটুনি না করি। কালই সে নতুন কাজের লোক রাখবে যাতে আমার শরীরএ অজথা চাপ না পড়ে। ফুরফুরে মনে ঘরে কাজকর্ম সারতে লাগ্লাম আমি। এত আগে না হলেও হয় কিন্তু আমি মনস্থির করে ফেললাম আগামি সপ্তাহে কাজে যোগ দিয়েই আমার ইস্তফাপত্র ফেলে দেব। সত্যি বলতে কি, এই ক'বছর চাকরি করে। সংসার খরচ বাদ দিলে বেশিরভাগটাই আমি জমাতাম। বিয়েতেও খরচ তেমন হয়নি। অংকুর হয়ত আমায় আর কারখানায় যেতেও দেবেনা। আমার জমানো টাকা দিয়ে বছর কয়েক ঠিক চালিয়ে নেব। তারপর বাচ্চা একটু বড় হলে নাহয় আবার

কোন কাজ খুঁজে নেব। দেখতে দেখতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নেমে এলো।
আলমারি খুললাম আমার জয়েনিং লেটারটা ফাইল থেকে নামাবো বলে। ইস্তফার সাথে ওটার একটা কপি দিতে লাগবে। আমার ফাইলের তলায় কাপড়ের আড়ালে হাতে ঠেকল আরেকটা ফাইল। এটা বোধহয় অঙ্কুরের। টেনে বের করলাম দুটো ফাইলই। আমারটার থেকে জয়েনিং লেটারটা বের করলাম। তারপর সন্তর্পণে খুললাম ওর ফাইলটা। জানলার পর্দাগুলো হঠাৎ নেচে উঠল দমকা হাওয়ায়। ঝড় আসবে নাকি? উঠে বন্ধ করে দিলাম কপাটগুলো। তারপর কোলে তুলে নিলাম খয়েরী রঙের অচেনা ফাইলটা। খুললাম। ভেতরে বহু পুরনো সব কাগজপত্র। ওদের পুরনো বাড়ি ভাড়ার চালান, ওর স্কুল কলেজের মার্কশিট... এটা কি? ব্রাউন পেপার মোড়ানো একটা বহু পুরনো হলদে রঙের কাগজের টুকরো।... ভুরু কুঁচকে গেল আমার। অপরে লেখা "ST. MARGARET ORPHANAGE AND

ADOPTION CENTRE. SILIGURI."

বুক ধুকপুক করতে আরম্ভ করল আমার... চোখ নেমে এলো কাগজের নিচের দিকে। তাতে লেখাঃ

This is to certify that a male child aged approximately 3 months, named Ankur, henceforth to be known as Ankur Kumar Sen vide Affidavit No: 77451 filed at Siliguri Court dated 28th January 1978, has been formally adopted by Mr. Saswata Sen and Mrs. Dorothy Sen on this 13th Day of February, Friday.

হাত কাঁপতে লাগলো আমার! গলাটা যেন হঠাৎ শুকিয়ে গেল। আমার স্বামী আদৌ তার বাবা-মার সন্তান নয়! আর এই কথা এতদিন ধরে আমায় লুকিয়ে যাওয়া হয়েছে! এটা জানলেও ত আমি বিয়ে ভেঙ্গে দিতাম না... তাহলে কেন? কেন? কেন?

এবার চোখ পড়ল ফাইলের তলায় লুকিয়ে থাকা আরেকটা কাগজের ওপর। বের করে আনলাম সেটা। একটা বহু পুরনো হলদে হয়ে যাওয়া খবরের কাগজের টুকরো। হেডলাইনটা চোখে পড়ল আমার...

দম আটকে গেল!

মস্তিষ্ক প্রাণপণে চোখকে বলতে লাগলো; পড়িস না... পড়িস না... কিন্তু চোখ এগিয়ে চলল...

সেবকের পুড়ে যাওয়া বাড়ির পেছন থেকে উদ্ধার সদ্যজাত।

সেবকঃ ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭৭

পুড়ে যাওয়া যেই কুঁড়েঘরটি কয়েকমাস আগে গোটা পরিবারের মারা যাওয়ার সাক্ষী হয়েছিল, তারই পেছন থেকে উদ্ধার হল এক সদ্যোজাত শিশুপুত্র। বস্তুত এই কুঁড়েঘরটিতেই পুড়ে মারা যায় বাবা-মা সহ তাদের শিশুকন্যা। তাদের ১২ বছরের পুত্রের গলাকাটা মৃতদেহ আবিষ্কারর হয় বাড়ির পেছনে। সেই ঘটনা এখনও

তদন্তাধীন।
এদিন ভোররাতে শিশুর কান্না শুনে গ্রামবাসীরা এসে শিশুপুত্রটিকে উদ্ধার করে। শিশুটিকে শিলিগুড়ির সেন্ট মারগারেট অনাথাশ্রমে আপাতত রাখা হয়েছে।

হাত থেকে কাগজটা উড়ে গেল দমকা হাওয়ায়। জানলাগুলো ঝড়ের ঝাপটায় খুলে গেছে। আমি কাঁপতে কাঁপতে মেঝে বসে পড়লাম। হঠাৎ বিকট শব্দে বাজ পড়ার সাথে সাথে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল।
না... না... না, এ সত্যি হতে পারেনা। সব গল্প... সব কাকতালীয়... আমার স্বামী... আমার স্বামী তাহলে...?
বিশ্বের সব আতঙ্ক একসাথে আমার মনে চেপে বসল। কানে বাজতে লাগলো অনুসূয়াদির অব্যর্থ সতর্কবাণী...
... ভূমির গর্ভে জন্ম নেওয়া এক প্রাচীন অপদেবতা যে আজও কোনও না কোনও রূপে পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার পরের

শিকারের খোঁজে...
রক্তবীজ!... অংকুর?
হঠাৎ উঠোনে পায়ের শব্দ!
উঠে দাঁড়ালাম। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বাইরে। ধুলোর চাদরের ভেতর দিয়ে দেখতে পেলাম... ওটা কে? উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে একটা ছায়ামূর্তি! অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছেনা। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি তার দৃষ্টি সটান আমার দিকে।
যার আগমনে এতদিন খুশির বন্যা বয়ে যেত মনের মধ্যে, আজ তাকে দেখে বিভীষিকায় শরীর জমে গেল। চিৎকার করে বারান্দার গ্রিলের দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিলাম।
হাসছে অংকুর! অট্টহাসি! ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে তার নারকীয় হাসি কানে আসতে লাগলো। এক পা দু পা করে সে বারান্দার দিকে এগিয়ে আসছে। তার আর আমার মধ্যে শুধু গ্রিলের দরজাটা।
আমার মুখোমুখি এসে সে দাঁড়াল। আকাশ

জুড়ে ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ। তারই আলোয় দেখলাম তার চোখদুটো টকটকে লাল! মুখের, গলার শিরা-উপশিরাগুলো দগদগে হয়ে ফুলে উঠেছে! রক্তবীজের প্রকৃত রূপ! আমি জানি গলার রক্ত উঠিয়ে চেঁচালেও এখানে আমার চিৎকার শোনার মত কেউ নেই।
"আমি তোকে মারব না..." হাওয়ার মত ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল অংকুর। এ গলা তার গলা নয়! "তুইই তো আমার বংশ বিস্তার করবি। আমার রক্তে মাটি ভিজলেও ততক্ষণ আমার নতুন শরীরে প্রাণের সঞ্চার হবেনা যতক্ষণ আমার মৃত্যু না হয়। তোর মধ্যে যে বেড়ে উঠছে, সে হবে আমারই মতন! আমার সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে সে জন্ম নেবে! তারপর তোর মত আরও একজন... তারপর আরও একজন...!" অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল অপদেবতা!
ঘুরে দাঁড়াল সে। তারপর পায়ে পায়ে নেমে গেল উঠোনে শক্ত মাটির ওপর। বুক পকেট থেকে ষ্টীলের কলমটা বের করল। তারপর আকাশের

দিকে তাকিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় উঁচু স্বরে কিছু একটা বলল। আকাশ চিড়ে বিদ্যুতের ছটা খেলে গেল। পৃথিবী যেন প্রলয়ের মাঝে এই পৈশাচিক খেলায় মেতেছে রক্তবীজের সাথে। আমি অসহায়! নিরুপায়! কিছু করার নেই আমার...
আবার বিদ্যুতের ঝলক! দেওয়ালে লাগানো কালো হয়ে আসা মা কালীর ছবিটা দুবার উজ্জ্বল হয়ে উঠে আবার অন্ধকারে হারিয়ে গেলো...
ফিরে তাকালাম উঠোনের দিকে। কোনও জাদুবলে যেন আমার মন হঠাৎ দৃঢ় হয়ে উঠেছে। আর নয়! আর কখনও নয়! আমার মরণ হলেও নয়! এই ভয়ঙ্কর অভিশাপ আজই শেষ হবে! এখুনি শেষ হবে!
এক ঝটকায় গ্রিলের গেটটা খুলে খালি পায়ে উঠোনে নামলাম। ধুলোর রাশি মুখে এসে লাগলো। খোঁপাটা হাওয়ার দাপটে খুলে গিয়ে লম্বা চুলটা উড়ে গেল পেছনদিকে।
অপদেবতাটা কলমটা বের করে হাতটা সামনের

দিকে বেঁকিয়ে সজোরে গেঁথে দিল নিজের গলায়! তারপর গর্জন করে হিঁচড়ে টেনে বের করে আনল। গলার গর্ত দিয়ে ফিনকি দিয়ে বেড়িয়ে এলো টাটকা রক্তের ফোয়ারা! আমি এক লাফে আমার "স্বামীকে" জাপটে ধরে হাঁ করে ঠোঁট দুটো চেপে ধরলাম গলার ফুটোর ওপর। গরম রক্তের ধারায় মুখ ভরে গেল। বিকট নোনতা স্বাদের পাপের ঝর্ণা গলা বেয়ে পেটে নেমে যেতে লাগলো আমার। ঝটকা মেরে প্রাণপণে আমায় ছাড়াবার চেষ্টা করল পিশাচটা। আমি বাহুর জোর যতটা পারি বাড়িয়ে চেপে ধরলাম তাকে। নাক দিকে দম টেনে চুষে চাপ বাড়িয়ে দিলাম তার ক্ষতের ওপর, যাতে গলা থেকে বেরোনো এক ফোঁটা রক্তও মাটিতে না পড়ে। ঝড়ে কেঁপে উঠছে দিক-বিদিক। বমি এসে গেল রক্তের বাণ পেটে যেতে যেতে। কিন্তু আমি নড়লাম না। আজ নয়... রক্তক্ষরণের সাথে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে এলো অংকুর। আমায় সরিয়ে দেওয়ার সমস্ত চেষ্টা যখন বৃথা হল... খানিক্ষন সেইভাবেই

দাঁড়িয়ে রইল সে... তারপর আমি বাহু আলগা করলাম... মুখের রক্ত সবটা গিলে নিয়ে তার গলা থেকে ঠোঁট সরালাম। অংকুর নিস্তেজ হয়ে ধপ করে পড়ে গেল মাটিতে...
আমি বসে পড়লাম তার পাশে। কি অবস্থায় আছি, কি করছি কিছু মাথায় এলো না। কয়েক মিনিট সেইভাবে থাকার পর হুঁশ এলো... আর হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলাম। কাঁদতে কাঁদতে অঙ্কুরের দেহর বুকে মাথা রাখলাম শেষ আলিঙ্গনে...
বৃষ্টি নামলো। খোলা চুলের সিঁথির ভেতর থেকে সিঁদুরটা ধুয়ে গেল একটু একটু করে...
***

সেই রাতে মেসের সবাই আমায় এত উপকার করেছিল যা আমি জন্মে শোধ করতে পারব না। অনুসূয়াদি এসে তার এক চেনা হাতুড়ে ডাক্তার কে বেশি টাকার টোপ দিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট লিখিয়ে দামোদরের পাড়ে অংকুরকে দাহ করা হয়েছিল। কেউ ঘুণাক্ষরেও তের পায়নি সে

কিভাবে মরেছিল। পনেরো দিন আমি পেটের ইনফেকশনে ভুগেছিলাম। তখন আমায় সম্পূর্ণ দেখভাল আমার মেসের দিদিরা করেছিল। কাউন্সেলিং করালে হয়ত ভাল হত কিন্তু সেটা হলে আমায় সত্যি কথা বলতে হত, যেটা সম্ভব ছিলনা

শেষ একটা কাজ শুধু বাকি রইল। সবচেয়ে কঠিন কাজ।

একা একাই গেলাম স্ত্রীরোগ বিষেশজ্ঞের কাছে।

“আপনার মৃত স্বামীর একমাত্র স্মৃতি আপনার গর্ভের সন্তান। চাইছেন না কেন?”

“স্বামীর অবর্তমানে সন্তানের ভরণপোষণ করার আর্থিক বা মানসিক অবস্থা আমার নেই।”

মহিলা ডাক্তার আমার দিকে সন্দেহের চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে গর্ভপাতের দুটো ওষুধ লিখে দিলেন।

“তিন-চারদিন হেভি ব্লীডিং হবে। কিন্তু বাচ্চাটা থাকবে না। নিশ্চিন্ত থাকুন।”

ঘরে এসে নিয়ম মেনে ওষুধদুটো খেয়ে নিলাম। চোখ ফেটে জল আসছিল কিন্তু আমি মনকে

বোঝালাম। এই পাপের বীজকে আমি কিছুতেই আমার গর্ভ থেকে পৃথিবীর আলো দেখতে দেব না।
দু-তিনদিন খুব দুর্বল ছিলাম। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্য তলপেটেও ব্যাথা ছিল।
তারপর একদিন সকালে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলাম। প্রান ভরে শ্বাস নিলাম সকালের মুক্ত বাতাসে। ঝলমলে রোদ উঠেছে বাইরে। একটা চেয়ার টেনে দাওয়ায় এসে বসলাম। কয়েকটা ছাতারে পাখি কুলগাছটায় ঝগড়া করে যাচ্ছে। তার তলায় নরম রোদ গায়ে মেখে দুটো বাচ্চা কুকুর জড়াজড়ি করে খেলছে।
হঠাৎ আমার বুক হিম হয়ে গেল!
না... না... না... হে ইশ্বর!...
চেয়ার ছেড়ে প্রাণপণে দৌড় লাগালাম মেসের পেছনদিকে। সেখানে রাস্তার ধারে একটা ডাস্টবিন আছে। প্রতি শনিবার ময়লার গাড়ি এসে ময়লা তুলে নিয়ে যায়। গত দু দিনের ব্যাবহার করা প্যাডগুলো একটা সবুজ প্যাকেটে মুড়ে আমি ওই ডাস্টবিনে

ফেলেছিলাম। গিয়ে দেখি বাচ্চা কুকুরদুটোর মা সবুজ প্যাকেটটা টেনে বের করে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়েছে। আমার গর্বে মরা রক্তবীজের সন্তানের রক্তে ভেজা তুলোর টুকরোগুলো মাটির ওপর রাস্তা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে!...

সমাপ্ত